ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN: 2582 - 0427 (Online)
Vol. 3, No. 1
March, 2021
http://www.ensembledrms.in

Article Type: Research Article
Article Ref. No.: 20100600388SF
https://doi.org/10.37948/ensemble-2021-0301-a025

বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকট ও বাউল চেতনা

(Bangalir Sanskritik Atmaparichayer Sankat O Baul Chetona)

Somen Paul[1]✉

সারসংক্ষেপ:

আত্মপরিচয়ের সংকট হল ব্যক্তির এমন একটা অবস্থা, যেখানে ব্যক্তি নিজের সত্তা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা অনুভব করে এবং সেই সঙ্গে নিজের সামাজিক চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য সংগ্রাম করেও ব্যর্থ হয়। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের মধ্যেও এই ধরনের সংকটবোধ লক্ষ করা যায়। নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও চর্চার ঘাটতির ফলে তৈরি হয় আত্মপরিচয়ের সংকট। এই সংকট দূর করতে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা প্রয়োজন। কিন্তু বাঙালির 'চিন্তাহীনতা'-ই বাঙালি-সংস্কৃতির আত্মপরিচয় গঠনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালির এই সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তি পেতে বাউলের গভীর মানবতাবাদী জীবনদর্শন কীভাবে সাহায্য করতে পারে, সেটাই বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়। বাউলের দর্শন প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনেরই দর্শন, যে দর্শন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ না করে সবাইকে মনুষ্যত্বের আহ্বানে একত্রিত করে। বাউল মতে, প্রথমে আত্মাকে জানতে হয়; চিনতে হয়। আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। নিজের আত্মাকে, মনকে শুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই সকল প্রকার মঙ্গল নিহিত। বাউলরা তাই মনের মানুষের সন্ধান করেন। সেই মনের মানুষ কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ নন, 'ক্ষুদ্র আমি'র ভেতর লুকিয়ে থাকা 'বড়ো আমি', যে আমি 'সর্ব আমি'র ভেতর বিস্তৃত। আমাদের মতো জাগতিক মানুষের কাছে জগৎ-সংসার দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই দুর্বোধ্য রহস্যের কথাই বাউলরা সহজ ও সরল করে বুঝিয়ে দেন। জীবনের গভীরতা ও অর্থবহতা অনুসন্ধানে বাংলার প্রকৃত সন্তান এঁরাই। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হলে এঁদের স্মরণ গ্রহণ করা আবশ্যকীয়।

Keywords: মানবতা, জীবনাচার, ঐতিহ্য, আত্মশক্তি, সাম্প্রীতি, জীবনদর্শন

'পরিচয়' হল কিছু গুণাবলি, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গি– যা একজন ব্যক্তিকে গড়ে তোলে। 'পরিচয়' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'identity'। শব্দটা এসেছে লাতিন 'Idem' থেকে, যার অর্থ 'the same'। Identity বা পরিচয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন, "(Identity) refers to the ways in which individuals and groups define themselves and are defined by others on the basis of race, ethnicity, religion, language and culture." (Jenkins, 1996, p. 4)

সুতরাং এককথায় বলতে পারি, পরিচয় (identity) হল এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করে এবং এমন কিছু গুণাবলি যার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে অন্যের থেকে পৃথক করতে পারা যায়। কিন্তু যখন বলি আত্মপরিচয়, তখন 'আত্ম' (Self) শব্দটার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই ইঙ্গিত করা হয়। এই অনুভূতিগুলোর সাহায্যে যখন কোনো ব্যক্তি নিজের পরিচয় নিজেই নির্ধারণ করতে পারে, তখন সেই অনুভূতিগুলোকেই বলা হয় আত্মপরিচয় (self-identity)। আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বলেন, "(Self-identity is) relatively stable, role-specific understandings and expectations about self." (Wendt, 1992, p. 397)

1 [Author] ✉ [Corresponding Author] Assistant Professor, Women's College Tinsukia, Rangagora Road, Durgabari, Tinsukia, Assam, 786125, INDIA. E-mail: somen5920@gmail.com

© 2021 Ensemble; The author

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

‘সংকট’ বলতে বোঝানো হয় মানুষের ব্যক্তিগত অসুবিধা বা পরিস্থিতিকে যা মানবজীবনকে নিশ্চল করে দেয় এবং জীবনকে সচেতনভাবে পরিচালনা করতে বাধা প্রদান করে। ‘সংকট’ শব্দের ইংরেজি হল ‘crisis’। crisis বা সংকটের ধারণা প্রদান করতে গিয়ে সমালোচক জানিয়েছেন, “Crisis is a state of disorganization in which people face frustration of important life goals or cycle and methods of coping with stressors. The term crisis refers to a person’s feeling of fear, shock and distress about the disruption itself.” (Kroger, 2004, P. 19)

এবার আসা যাক আত্মপরিচয়ের সংকট প্রসঙ্গে। যখন কোনো ব্যক্তি সামাজিক পরিবর্তনের কারণে প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে মানসিক চাপের জন্য নিজের পরিচয় (Self-identity) সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলে আত্মপরিচয়ের সংকট। আত্মপরিচয়ের সংকটকে ইংরেজিতে ‘self-identity crisis’ বলা হয়ে থাকে। ‘Identity crisis’ অভিধাটা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Mt. Zion Veterans-এর পুনর্বাসন কেন্দ্রে। বিকাশমূলক মনস্তাত্ত্বিক Erik Homburger Erikson অভিধাটা পুনরুদ্ধার করে প্রথম এর যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আত্মপরিচয়ের সংকটের ধারণা প্রদান করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন,

> When an individual being unable to answer of some questions like who am I? What can I do? What is my position in society and its constituent bodies? What is my status in group – community and organization? What is my goal of life? What do I need? etc. then that man is identified as an owner of self-identity crisis. So the practical problems of ‘I’, ‘my’ and ‘me’ represent the crisis of self-identity. (Mishra & Khatun, 2014, p. 1121)

কোনো ব্যক্তি আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে কিনা, সেটা বোঝার জন্য মনস্তাত্ত্বিকরা বেশ কিছু লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলো হল:

- অবস্থা অনুযায়ী সর্বদা নিজেকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হওয়া।
- ঘন ঘন নিজের মতামত বদল করা।
- নিজের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করাকে অপছন্দ করা।
- সহজেই বিষণ্ন হয়ে পড়া।
- সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনো গভীরতা খুঁজে না পাওয়া।
- জীবন সম্পর্কে আরও গভীর তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া।
- নিজের মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, আগ্রহ, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করা।
- সমাজে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্বকীয়-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি।

আত্মপরিচয়ের সংকট প্রধানত দু’রকমের হয়– প্রেষণা সংকট (Motivation crisis) এবং বৈধতা সংকট (Legitimation crisis)। প্রেষণা সংকট তখনই দেখা দেয়, যখন ব্যক্তি নিজের ‘সত্তা’ (self) সম্পর্কে অভাববোধ করে এবং সেই সঙ্গে নিজের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যায়। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং নিজের পছন্দগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ দিতে অপরাগ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ব্যক্তি যখন সামাজিক চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হয়, তখন হয় বৈধতা সংকট।

সুতরাং, প্রেষণা সংকট দেখা দিলে পরিচয় ঘাটতি (identity deficit) হয়, এবং বৈধতা সংকট দেখা দিলে হয় পরিচয় সংঘাত (identity conflict)। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যে উক্ত দুই প্রকার সংকটই বিদ্যমান।

(২)

‘সংস্কৃতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি করলে দাঁড়ায় সম্-√কৃ+ক্তিন্। শব্দটা ইংরেজি ‘Culture’ শব্দের সমার্থকরূপে মারাঠি ভাষায় প্রথম ব্যবহার করা হয়। তার অনুকরণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় ‘সংস্কৃতি’ শব্দ গ্রহণ করেন। (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃ. ৮)

‘Culture’ কথাটা এসেছে লাতিন ‘Cultura’ থেকে, যার অর্থ ‘a cultivating, agriculture’। ‘Culture’ শব্দটা আধুনিক নৃবিজ্ঞানে ও সমাজবিজ্ঞানে দুটো স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, “Culture . . . is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” (Tylor, 1871, p. 1) সমাজবিজ্ঞান বলছে, “Culture . . . consists . . . in patterned or ordered systems of symbols which are objects of the orientation of action, internalized components of the personalities of individual actors and institutionalized patterns of social systems.” (Parsons, 1991, p. 220)

মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটা সমন্বিত কাঠামোকে সংস্কৃতি বলা যায়। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন, উৎসব, শিল্পকর্ম এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। এমনকি সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের শিক্ষা, সামর্থ্য যেসব মানুষ আয়ত্ত করে, সেই সবই সংস্কৃতি। সর্বোপরি সংস্কৃতি হচ্ছে মনুষ্যত্বেরই নির্যাস। সামাজিক ক্ষেত্রে এটা একটা সমাজের স্বচ্ছ দর্পণ। যে দর্পণের দিকে তাকালে সেই সমাজের মানুষের জীবনাচার, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

যে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলা ভাষায় স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে তাদের বাঙালি বলা হয়। বাংলাদেশে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেশের জল-বায়ু ও তার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে, গত সহস্র বছর ধরে যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেটাই বাঙালি সংস্কৃতি। (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৫২, পৃ. ১) উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি আজ অপসংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। অপসংস্কৃতি বলতে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয় এমন বোঝায়। সংস্কৃতি যতই খারাপ হোক, সেটা সংস্কৃতিই। সংস্কৃতি একটা ন্যায্য ধারায় বহমান, মানুষের সভ্যতা সেটাকে যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই যায়।

বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয় ধর্ম-আধুনিকতা-প্রগতিশীলতার একটা আপরিণত সহাবস্থানে। যেখানে দাঁড়িয়ে এমন একটা ভ্রান্তিমূলক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যার ভেতর অসংখ্য স্ববিরোধিতা ও শেকড়হীনতা বিদ্যমান।

সংস্কৃতির স্বভাবের ভেতর আত্মপরিচয়ের অভাব থাকতে পারে। যেকোনো অভাবের ওপর ভর করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে না। এই অভাব একটা সংকটের নাম, না পাওয়ার বেদনার হতাশা নয়। এটাকে আরও একটু গভীরভাবে বলা যেতে পারে ‘স্বভাবের অভাব’; অভাবের স্বভাব নয়।

মানুষের আচরণ ও চরিত্রের ভেতর দিয়ে সভ্যতার স্বভাব গড়ে ওঠে। এই স্বভাবের ভেতর যেসব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে, তা যেমন সভ্যতার সম্ভাবনা তেমনি সংকটও। বড়ো বড়ো সভ্যতার সুবর্ণ সময়েও ভেতরে ভেতরে ঘটেছে অমানবিক, নিষ্প্রাণ, আত্মজাগরণহীন সমৃদ্ধি; যার তলায় শেষে মানুষই হারিয়ে গেছে।

উনিশ শতকের পশ্চিমা চিন্তাকাঠামোর সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনটা ছিল ‘ঈশ্বরের মৃত্যু’। মানবসত্তার বিকাশে কাল্পনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরভাবনা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছিল। বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধান, ধর্মের জিজ্ঞাসাহীন প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে তৎপর হয়েছিল। মানুষ চাঁদের আলোয় মুগ্ধ না হয়ে চাঁদকে ছুঁয়ে দেখবার স্বপ্ন দেখেছে। বিশ শতকে এসে বিজ্ঞানচেতনা প্রযুক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজেই যেন ঈশ্বরের স্থান দখল করে বসেছে। ঈশ্বরচেতনা ও আধ্যাত্মিকতা যেমন ধর্ম কাঠামোর ভেতর হারিয়ে যায়, তেমনি বিজ্ঞানচেতনাও প্রযুক্তির অমানবিক উন্নয়নে কোথাও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। বিশ শতকে দেখা যায় ‘মানুষই মৃত’। মানুষের মুক্তি ধর্মের বদলে বিজ্ঞান দিয়েও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজকের একবিংশ শতক আমাদের কাছে উনিশ শতকের ‘মৃত ঈশ্বর’ ও বিশ শতকের ‘মৃত মানুষ’-এর পুনর্জাগরণের সময় হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। চার্চ, পুরোহিত, মোল্লাতন্ত্রে বন্দী যে ঈশ্বরকে আধুনিক মানুষ মৃত জ্ঞান করেছে; প্রযুক্তিবিদ্যার অমানবিক সমৃদ্ধিতে যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ম্লান হয়ে গেছে, মৃতবৎ সেই ঈশ্বর ও মানুষের আজ যৌথভাবে জেগে ওঠা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই প্রয়োজন মানুষের ভেতরের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংগ্রামের। মানুষ যে অর্থহীন ভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানচিন্তার সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত অসহায় প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে, সেখান থেকে তার মুক্তির প্রয়োজন। এই উভয় সংকট থেকে বেরোতে না পারলে তার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি কোনো সফলতাই বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।

কোনো কোনো সমালোচক সংকটকে ইতিবাচক দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, সংস্কৃতির সংকট নয়। সংকট নিজেই সংস্কৃতি। এদেশের মতো অনেক দেশেই এই চর্চা বহমান। সংকট এখনকার জীবনাচরণের অংশ। জাতীয় জীবন কিংবা লোকজীবন, সবক্ষেত্রেই সংকট নিজেই একটা আচারে পরিণত হয়েছে। সংকটকে সংস্কৃতি বলার বড়ো যুক্তি হচ্ছে, সেটা এমনভাবে জীবনের অংশ হয়ে গেছে যে মানুষ সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারছে না। সংকটকে তখনই আমরা সংস্কৃতি বলবো না, যখন দেখবো এটাকে মোকাবিলার চেষ্টা হচ্ছে। বরং এখনকার মানুষ সংকটকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে অকৃত্রিমভাবে মিশিয়ে নিয়েছে। নিম্নবর্গের হিন্দুরা মুসলমান হওয়ার কারণে, অথবা হিন্দুরা বৈষ্ণববাদ গ্রহণের কারণে বা একেশ্বরবাদ গ্রহণে অথবা হিন্দু-মুসলমান বাউল হয়ে যাওয়ায় যেমন নতুন কিছু চর্চার মধ্যে যেতে হয়েছে, তেমনি সংকটও এখনকার জীবনে নানা চর্চার ফল হিসেবে বহমান থেকেছে। একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, স্বৈরশাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অভাব, দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, উগ্রবাদ ও মৌলবাদ, উত্তর-ঔপনিবেশিকতা নানা কারণে সংকট একটা চর্চায় পরিণত হয়েছে। যুগের পর যুগ এটাই চলছে।

মানবিক পৃথিবীর জন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কতখানি জরুরি তা বিবেকবান মানুষমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি; তা কি কেবল উপভোগ করে সময় কাটাবার বস্তু, নাকি এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণামূলক তৎপরতা, সেটা বোঝা দরকার। সংস্কৃতির অন্তঃধর্মকে চিনতে না পারলে সভ্যতার মর্মে পৌঁছানো যায় না। সংস্কৃতির ধ্যান-ধরন-ধারাবাহিকতা দিয়েই বিরাট সব সভ্যতাকে মানুষ চিনতে পেরেছে, মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে। এটাই সংস্কৃতির ধর্ম, যা মৌলিক জীবনবোধ ও দর্শনের ছায়াস্বরূপ দেশ-কাল-সমাজে রূপান্তর হয়। যাকে পারলৌকিক ধর্ম-কাঠামোর মতো নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এই তার সৌন্দর্য। মানব সভ্যতার উত্থান পতনেও এই সৌন্দর্য হারিয়ে যায় না।

মানুষের জীবনের একটা অমূল্য পাওয়া জাতিগত আত্মপরিচয়। নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও চর্চার ঘাটতি আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করে। আমি আসলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর যখন আমি নিজেই পাই না, আবার আমি যা সেটা যখন সবাই স্বীকৃতি দেয় না, তখন এই আত্মপরিচয়ের সংকট প্রবল অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এই সংকট দূর করতে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা চাই। আমরা আমাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনোত্তরকালে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী শ্রেণি ও তাদের উৎসাহদাতা এক অনুসারীরা অতি সুকৌশলে আমাদের সমাজজীবনকে বহুধা বিভক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। আসলে ঔপনিবেশিক প্রেতাত্মা জাতিকে ‘বিভাজন ও শাসন’ নীতিমালার মাধ্যমে রাজনৈতিক ফয়দা হাসিল করে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। হতাশ হই, যখন আমরা অহেতুক জড়িয়ে পড়ি জাতিসত্তার পরিচয়ের বিতর্কে। এখনও আমরা যুক্তি-তর্কে ঘাম ঝরাই– আমরা বাঙালি না ভারতীয়? প্রকৃতপক্ষে জাতিসত্তার নানা পরিচয় যে হতে পারে, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমরা রাখি না। আসলে এটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাগ্রসরতার ব্যর্থতার প্রমাণ। কারণ দুটোই আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়– প্রথমটা আমাদের সাংস্কৃতিক জাতিসত্তার পরিচয়, আর অপরটা আমাদের রাজনৈতিক জাতিসত্তার পরিচয়। এই সহজ সত্যটুকু মেনে নিতে আমাদের বাধা কোথায়? বিভেদের রাজনীতিতে মশগুল বলে দেশ ও জাতির স্বার্থে আত্মপরিচয়ের সংকট নিরসনের সময় আমাদের নেই। বাঙালি সংস্কৃতির আজকের প্রধান উপাদান হচ্ছে ‘চিন্তাহীনতা’।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তি পেতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাউল সমাজ ও তার গভীর মানবতাবাদী জীবনদর্শনকে মুখ্য ধরা হয়েছে। যার পরিচয় না পেলে সংস্কৃতির নিজস্ব ধর্মকে আমাদের চিনতে ভুল হবে।

(৩)

বাউলের যে দর্শন তা আমাদের জীবনেরই দর্শন, যে দর্শন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-পেশার মধ্যে ভেদাভেদ না করে সবাইকে মনুষ্যত্বের আহ্বানে একত্রিত করে। এটা সমগ্র মানবজাতির দর্শন, যার ছায়ায় সব ধর্মের-গোত্রের-সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হতে পারে। মানুষে মানুষে যখন ভালোবাসার ঘাটতি হয়, তখন শুরু হয় সংকট। এই পরিস্থিতির উত্তরণে বাউল-ভাবদর্শন পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালির এই ঐতিহ্য আজও হারায় নি। আজও হাটে-ঘাটে-প্রান্তরে বাউলকণ্ঠে সেই বাণী শুনতে পাই। মানববাদী বাউলেরা আজও উদাত্তকণ্ঠে মানুষকে মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়, আজও তারা মানবতার শ্রেষ্ঠ সাধক ও চিন্তানায়কের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সাম্য, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির বাণী শোনায়।

বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। পনের শতকের মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ গ্রন্থে প্রথম ‘বাউল’ শব্দের সন্ধান পাই– “মুকল মাথার চুল/ নাংটা যেন বাউল/ রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।” (মিত্র, ১৯৪৪, পৃ. ৫২৯) এ

থেকে অনুমান করা হয় যে অন্ততঃপক্ষে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক কিংবা তার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

বাউল শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি নিয়ে বেশ কয়েকটা মতামত আছে। যেমন:

- কেউ বলেন 'বাউর' (এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা) থেকে 'বাউল' নামটার উৎপত্তি।
- হিন্দি 'বাউরা' (পাগলা, ক্ষ্যাপা) থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে কারোর অভিমত।
- কেউ বলেন 'ব্যাকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।
- কারো কারো মতে 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে স্বার্থিক 'ল' যুক্ত হয়ে, বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার দ্বারা সাধনাকারী অর্থে 'বাউল' শব্দ তৈরি হয়েছে।
- কেউ কেউ মনে করেন 'বা' শব্দের সঙ্গে 'উল' শব্দ যোগে বাউল শব্দ গঠিত। 'বা' অর্থ বাতাস, আর 'উল' অর্থ অনুসন্ধান করা। বাউল মানে যাঁরা বাতাসের অনুসন্ধানী। অর্থাৎ, এই দেহে বাতাসরূপী যে প্রাণবায়ু খেলা করে সেই মনের মানুষের সন্ধানই বাউলের করণকার্য।
- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে মত দিয়েছেন।
- ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এইভাবে–আউয়াল> আউল> বাউল।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এইভাবে– বাউল্যা> বাউলা> বাউল।
- এস. এম. লুৎফর রহমান বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকের ব্যবহৃত 'ব্রজী' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে মত দিয়েছেন। ব্যুৎপত্তিটা এরূপ–ব্রজী> বজ্জির> বাজির> বজ্জিল> বাজিল> বাজুল> বাউল। (*বাউলতত্ত্ব ও বাউল গান*)
- আহমেদ শরীফ বলেন, বজ্রযানী বৌদ্ধদের যদি 'বজ্রকুল' নামে অভিহিত বলে অনুমান করা হয়, তাহলে 'ব্রজকুল' থেকে 'বাউল' হওয়া আরো সহজ–বজ্রকুল> বজ্জউল> বাজুল> বাউল। (*বাউলতত্ত্ব*)
- এস. এম. ইমামউদ্দিনের মতে, হিন্দি 'উন' শব্দের পূর্বে 'বা' অব্যয় যোগে 'বাউন' ও অপভ্রংশে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। (*বাউল মতবাদ ও ইসলাম*)
- আনোয়ারুল করিম জানিয়েছেন, প্রাচীন প্যালেস্টাইনের রাসসামরায় বা'আল নামের একজন প্রজননদেবতার উপাসনা করা হতো। এই দেবতার বা'আল নামটা লোকনিরুক্তি অনুসারে বা'আল> বাওল> বাউল এভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। (*বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*)

বাউলগানে সুফিভাবনাই প্রবল। সুফি সাধনায় যিনি সাধকের পরমারাধ্য তিনিই বাউলের মনের মানুষ, অটল মানুষ, অধর মানুষ, ভাবের মানুষ, রসের মানুষ। বাউলদের মতে তাঁর অবস্থান মানবদেহে। বাউলরা তাঁরই সান্নিধ্যলাভে পাগল হন। বাউল সাধনার মর্ম জুড়ে আছে মানুষতত্ত্বের ভূমিকা। তাইতো তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা গেয়েছেন–

মিলন হবে কত দিনে।

আমার মনের মানুষের সনে।।

চাতক প্রায় অহর্নিশি

চেয়ে আছে কালশশী

হব বলে চরণ দাসী

ও তা হয় না কপাল গুণে।।

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন

লুকালে না পায় অন্বেষণ

কালারে হারায়ে তেমন

ঐরূপ হেরি এ দর্পণে।।

এ রূপ যখন স্মরণ হয়

থাকে না লোক লজ্জার ভয়

লালন ফকির ভেবে বলে সদায়

ও প্রেম যে করে সেই জানে।।

(খান, ২০০৭, পৃ. ৩৬৯)

বাউল এক গুরুবাদী লৌকিক সম্প্রদায়। বাউল সাধনায় গুরু (বিধানদাতা), সাঁই (স্বামী) বা মুর্শিদই (পথনির্দেশক) সার্বভৌম শক্তি। গুরুর হাত ধরেই জ্ঞানরিক্ত শিষ্যের সাধন-ভজনের জগতে প্রবেশ। গুরুর মূল্য-মর্যাদা ও প্রয়োজন-গুরুত্বের কথা তাই লালনের গানে বারবার এসেছে–

গুরু সু-ভাব দাও আমার মনে।

তোমার চরণ যেন ভুলি নে।।

গুরু তুমি নিদয় যার প্রতি

ও তার সদায় ঘটে কুমতি

তুমি মনোরথের সারথি

যথা লেও যাই সেইখানে।।

গুরু তুমি মনের মন তরী

গুরু তুমি তন্ত্রে তন্তরী

গুরু তুমি যন্ত্রের যন্তরী

না বাজাও বাজবে কেনে।।

আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ান

গুরু তুমি বৈদ্য-সচেতন

চরণ দেখব আশায় কয় লালন

জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে।।

(খান, ২০০৭, পৃ. ২১৭)

বাউল গানের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এতে একটা উদাসী ভাব করা যায়; এর সুরে যেন মিশে থাকে না-পাওয়ার এক বেদনা। বাউল গানের সুরে কখনও কখনও ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর কারণ মাঝিমাল্লারাও অনেক সময় নৌকা বাইতে বাইতে ধীর লয়ে এই গান গেয়ে থাকে। বাউল গানের বিশেষত্ব এই যে, এই গান কেবল বাউল সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাউলের সাধন-ভজন জানে না এমন সাধারণ মানুষও অধ্যাত্মরসের কারণে এই গান নিজের করে নিয়েছে। বাউল গানে আছে বাংলার প্রকৃতি, মাটি আর মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা–ভাবনায় আছে এক উদার ও সমন্বয়বাদী মানবচেতনা।

বাউলদের জীবনাচার বিশ্লেষণ করলে দেখি; বাউল বলতে অতি নিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মগোপনশীল, সাংসারিক ভোগবিলাসে উদাসীন, ভাবের ঘোরে আত্মসম্মোহিত ও অন্যমনস্ক এক সম্প্রদায়; যাঁরা প্রবল দরিদ্রতা ও নানা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করেও নীরবে স্থির বিশ্বাসে আপন ধর্ম সাধনা করেন। কারণ এঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই

প্রচলিত সামাজিক রূপ থেকে আলাদা। এঁরা কোনো দেব-দেবী, পূজা-আচার, নামাজ-রোজা, মসজিদ-মন্দির, কোরান-বেদ মানেন না। বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদে এঁরা বিশ্বাসী নন। এঁরা থাকতে ভালোবাসেন সর্বজনগৃহীত জীবনধারার বাইরে। এজন্যই এঁদের আরেক নাম পাগল বা ক্ষ্যাপা। বাউলরা ঘুরে ঘুরে তাঁদের চিরন্তন অন্তর্যামী সত্তা মনের মানুষের গান গেয়ে থাকেন, এবং ধর্মে ধর্মে অযৌক্তিক ভেদাভেদের কথা তুলে ধরেন। বাউল কোনো সমাজচ্যুত গোষ্ঠী নয়। বাউল আমাদের সমাজেরই একটা ভাবুক সম্প্রদায়ের নাম। তাইতো লালন সাঁই গেয়েছেন–

এমন মানব জনম আর কি হবে।

মন যা কর ত্বরায় করো এই ভবে।।

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই

মানব রূপের উত্তম কিছু নাই

দেব-দেবতাগণ করে আরাধন

জন্ম নিতে এই মানবে।।

কত ভাগ্যের ফলে না জানি

পেয়েছ এই মানব তরণী

বেয়ে যাও ত্বরায়, তোমার সুধারায়

যেন ভারা না ডোবে।।

মানুষে হবে মাধুর্য ভজন

তাইতে মানব রূপ গঠলেন নিরাঞ্জন

এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার

লালন কয় কাতর ভাবে।।

(খান, ২০০৭, পৃ. ১২৪)

বাউল সম্প্রদায়ের লোকেদের পাগল ভাবা হলেও এঁরা যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। এঁরা শিক্ষিত না হলেও সমাজে প্রচলিত সকল ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। বাউলরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন আত্মাকে। তাঁদের মতে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা যায়। আত্মা দেহে বাস করে। তাই তাঁরা দেহকে পবিত্র জ্ঞান করেন। দেহবিচারের মাধ্যমে আত্মস্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেই সেই পরমাত্মার সন্ধান মেলে। সাধারণত প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও বাউলরা জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক গভীর কথা বলেছেন।

বাউলসাধনার সঙ্গে মিথুনাত্মক যোগসাধনার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। যৌন-সম্ভোগ নয়, যৌন-সংযম ও কাম নিয়ন্ত্রণই বাউলের মোক্ষের সঠিক পথ। রিপুকে জয় করে ‘কামের ঘরে কপাট’ না মারলে সাধন ভজনের সকল আয়োজনই বৃথা। লালন তাই হদিশ দিচ্ছেন সঠিক পথের–

জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি পারবি তোরা।

যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা।।

শোসায় শোষে না ছাড়ে বান

ঘোর তুফানে বায় তরী উজান

ও তার কামনদীতে চর পড়েছে

প্রেম-নদীতে জল পোরা।।

হাঁটতে মানা, আছে চরণ

মুখ আছে তার, খাইতে বারণ

ফকির লালন বলে, এ যে কঠিন মরণ

তা কি পারবি তোরা।।

(খান, ২০০৭, পৃ. ২৫৩)

বাউলদের ধর্মও স্বতন্ত্র। এই ধর্মপালনকারীদের বৈশিষ্ট্যগুলোও সাধারণদের থেকে আলাদা। তাঁরা নিজেদের হিন্দু-মুসলমান কোনো কিছু বলেই পরিচয় দেন না। বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সমালোচক বলেন, অষ্টম ও নবম শতকে প্যালেস্টাইনের রাসসামরায় বা'আল নামের একজন দেবতার উপাসনা করা হতো। বা'আল প্রজননের দেবতা হওয়ায় যৌনাচার এই ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। বা'আল ধর্ম একসময় এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে ইসলামের সুফিবাদী মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটার পর সম্ভবত ইসলাম ও পৌত্তলিকতা উভয় মতবাদের সংমিশ্রণে একটা নতুন লোকধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল; যার উপরিভাগে ছিল মুসলিম সুফিবাদের প্রাধান্য, অভ্যন্তরে ছিল তন্ত্র ও যোগনির্ভর দেহজ সাধনা। কালক্রমে এই বা'আল লোকধর্মই বাউল লোকধর্মে পরিণত হয়েছে। (করীম, ২০১৬, পৃ. ১৩৩-১৪৫)

বাউলরা যেমন হিন্দুধর্মের গলদ বের করে সংস্কারে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন, তেমনি মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধেও সমালোচনার খড়্গ তুলে ধরেন। এই মতবাদ কোনোমতেই হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের উপধর্ম নয়। এটা এই দুই ধর্মের বাইরে এক স্বতন্ত্র ধর্মমত। অনেকে বাউল ও বৈষ্ণবধর্মকে এক মনে করেন। কিন্তু বাউল ও বৈষ্ণব এক নয়। বিশিষ্ট সমালোচক বাউল ধর্মমত সম্পর্কে বলেন,

> ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত যার নাম নাথপন্থ। দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। (নাথপন্থ এবং সহজিয়া) এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক একসময় ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়, কিন্তু পুরনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলেই ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা পুরনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব। তাই হিন্দু গুরুর মুসলিম সাগরেদ বা মুসলিম গুরুর হিন্দু সাগরেদ গ্রহণে কোন বাধা নেই। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শরিয়তী ইসলামের বেড়া ভেঙে নিজের মনের মত করে পথ তৈরি করে নিয়েছে। (শরীফ, ২০০৬, পৃ. ৫৩-৫৪)

বাউল চলতি কথায় মরমী-সাধনপথের পথিক। বাউলের গান একদিকে দেহজরিপের গানস্বরূপ অন্বেষার গান, অপরদিকে এই গান নিম্নবর্গের মানুষের দ্রোহের গান, প্রতিবাদের গান, শ্রেণিচেতনার গান, শুভ্র-সুন্দর জীবনস্বপনের গানও। বাউলের জন্ম দ্রোহ থেকে। তাঁর সাধনা প্রচলিত শাস্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অগ্রাহ্য অস্বীকারের স্পর্ধার প্রতীক। তাঁর দর্শন বর্ণশোষণ ও জাতপাতের বিরুদ্ধে 'মানুষ সত্য'-এর উদার মানবিকতার দর্শন। তাঁর গান রূপক-প্রতীকের আড়ালে প্রবল প্রতিবাদের গান, প্রচলিত আচার-প্রথা-বিশ্বাসকে চূর্ণ করা নবজীবনের গান। বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, প্রথার শাসন থেকে মুক্তি, সংস্কার-আচারকে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে প্রতিস্থাপন বাউলের জীবনচেতনার মূল কথা। শুভবুদ্ধি ও কল্যাণচেতনায় অভিষিক্ত হয়ে প্রথাশাস্ত্র-ধর্মকে আঘাত করার সামাজিক শক্তি অর্জনের প্রয়াসী তাঁরা।

উদার ও প্রগতিশীল মানসতার কারণে সমকালীন সমাজে বাউল-সম্প্রদায়কে যথেষ্টই নিন্দিত ও নিগৃহীত হতে হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবাহক মৌলবাদীরা বাউলদের বিপক্ষে ছিলেন। মুসলমানের চোখে বাউলরা বেশরা-নেড়ার-রসের ফকির, আবার হিন্দুদের কাছে ব্রাত্য-কদাচারী হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মগুরু ও সমাজপতি উভয়ের নিকটেই বাউলদের বাণী অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বাউলরা তাঁদের উদার প্রেমধর্মের বাণীকে সমাজশিক্ষার বাহন করে ক্রমশ তাঁদের অনাকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। উত্তরকালেও বাউলরা আক্রান্ত হয়েছেন। বাউলবিরোধী আন্দোলন থেমে থাকেনি। জারি হয়েছে 'বাউলধ্বংস ফৎওয়া', রচিত হয়েছে 'রদ্দে নাড়া', 'ভণ্ড ফকীর', 'সাধু সাবধান', 'বাউল একটি চেতনা', 'নেড়ার ফকিরের গুপ্তকথা'-র মতো বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তিকা। তবে আশার কথা, স্বদেশে অনুদার-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাউলবিরোধী ভূমিকার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির সুস্থ ধারার চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা বাউলদের পাশে দাঁড়িয়াছেন। এইভাবে বাউল হয়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র।

(৪)

সাধকের হাতে গড়ে পিঠে তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা। আদি হতে আদিতম রূপটাকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় তার সমৃদ্ধি। ছন্দময়, কাব্যময়, গভীর অনুসন্ধানের গূঢ় হতে গূঢ় দার্শনিকতার চর্চা হয়েছে এই ভাষায়। অথচ তা গানের সুরেই। এই ভাষার প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যাবে গানের ভেতর। এখানে ভাষা-গান-সুর একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু যে ভাষার ভেতর গানের মাধ্যমে এত ঐতিহ্যমণ্ডিত দর্শনপাঠ ও জীবনজিজ্ঞাসা রয়েছে, সেই ভাষা কেন শিক্ষিত বাঙালি জীবনকে নাড়া দিতে পারেনি? কারণ, এই শিক্ষালাভ আরোপিত ও অনুকৃতিময়। বাঙালির আত্মপরিচয়ের উদাসীনতার এ এক ভিন্ন নজির। অধিকাংশের কাছে বাউলগণ আত্মভোলা উদাসীন শিল্পীমাত্র। জীবনবহির্ভূত প্রান্তিক উপজীবী। মধ্যবিত্তের বৃহৎ শিক্ষিত সমাজ এই ঐতিহ্য সম্পর্কে মূলত উদাসীন। তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্পূর্ণ কারণও এটা।

কিন্তু বাউল সমাজ প্রান্তিক হয়েও কতখানি অগ্রসর আমরা তা জানি। তাঁদের সাধনা নিছক ব্যক্তিগত সাধনা নয়। তাঁরা মানবজীবন ও মানুষকেই প্রধান অবলম্বন মনে করেন। এঁরা মানুষের দাসত্ব করেন, যে মানুষের ভেতর মনের মানুষের দেখা মেলে। সেই মনের মানুষ কোনো বিমূর্ত চরিত্র নয়, ক্ষুদ্র 'আমি'র ভেতর সুপ্ত থাকা 'পরম আমি'; যে আমি আমার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, 'সর্ব আমি'র ঐকতান। সেই ঐকতানে একটা বিশ্বময় বিরাট মনুষ্যত্বের অভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয়ই বাউলদের আরাধ্য, তাঁদের ধর্ম। এই কারণে বাউল পরম্পরাকে 'মানবধর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়। সমালোচক বলেছেন,

> বাংলাদেশের বাউলেরা সুরে তালে যে-সব গভীর তত্ত্বগান করেছেন তা আর কোনো ভাষায় বা আর কোনো প্রকারে প্রকাশ করাই অসম্ভব। কাজেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সংগীত পরস্পরে পরস্পরকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে। ধর্মে ও জ্ঞানে এদেশে বিরোধ ঘটে নি। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে দুঃখের অন্ত থাকে না। (সেন, ১৩৫২, পৃ. ২০)

বাউল বলে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মাচার নেই, সম্প্রদায়ও নেই; এ হল নানান ধর্ম ও মতের মানুষের উচ্চতর আত্মানুভবের মিলনস্থল। এঁরা পরমতসহিষ্ণু ও লোকায়ত। যেমন করে একজন বৈষ্ণব বাউল হন, একজন শাক্ত বা শৈব বাউল হতে পারেন, এমনকি খুঁজে দেখলে খ্রিস্টানদের ভেতরেও বাউল পাওয়া যাবে, তেমনি একজন ফকির লালন শাহও বাউল। রবীন্দ্রনাথ এই বাউলচেতনাকে 'মানুষের সহজধর্ম' বলে মত দিয়েছেন। এই চেতনাই বাংলার সবচেয়ে নিকটতর ও জনভিত্তিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক শক্তিমত্তার ভিত্তিমূল। ইসলামের সুফি-ফকিরি পরম্পরার মানবতাবাদী দর্শনের যে প্রভাব বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল হতে বিদ্যমান তার ভেতর দিয়ে সেই একই বাউলিয়ানা প্রকাশ পায়। চরম সাম্প্রদায়িক ও আচারসর্বস্ব ধর্মান্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাউলরাই প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে সক্ষম। তাঁদের এই সওয়াল জবাব শাস্ত্রানুগত হলেও যুক্তিপ্রবণ। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন,

> আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি–এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। (দাশগুপ্ত ও অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৮৪৮)

রবীন্দ্রনাথ যেকালে এই কথাগুলো বলেছিলেন সেই সময়কাল ও বাস্তবতা আজ আর নেই, কিন্তু বাউল সাধকগণ রয়েছেন স্বমহিমায়। বাউল সমাজ সময়ের হাল-হকিকতকে কতখানি সমঝদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেন এবং মানুষকে মহত্ত্বর জীবনবোধ ও উপলব্ধির আত্মসংগ্রামে টেনে নিতে চান তা আজকের প্রযুক্তিদাসত্ব ও পুঁজিকৈবল্যর যুগে দাঁড়িয়েও আমরা অনুধাবন করতে পারি।

বাউল পরম্পরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হল, তা প্রাতিষ্ঠানিকতা দোষে দুষ্ট নয়। বাংলার প্রতিষ্ঠানবিরোধী একমাত্র পূর্ণাঙ্গশক্তি এটা। সুদীর্ঘকাল ধরে বাউলরা আধুনিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নানান চাপান-উতোর প্রচেষ্টা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

আজকের এই পুঁজিবাদী ও কর্পোরেট আগ্রাসনের ভেতর দিয়ে খুব কম সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন যাঁরা বাউলদের তথাকথিত সাধনসংগীতকে সর্বব্যাপকতা দিয়ে দেখতে পান। তাঁদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণির। যাঁদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুখকর নয়।

প্রথাগত কিংবা প্রথাবিরুদ্ধ, যেকোনো অর্জনেরই একটা স্বধর্ম থাকে। ধর্মহীন কোনো অস্তিত্ব নেই। ধর্ম হল স্বভাব, ধারণ-আচরণ। তা যখন বৈচিত্র্যকে দমন করতে চায়, তখন সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। বাউলরা ধার্মিক, কিন্তু সাম্প্রদায়িক নন। তাঁরা বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, সময়কে ধারণ করেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলেন। এই সামনের দিকে এগিয়ে চলা মানে সমসাময়িক হয়ে ওঠা, বর্তমানকে নিয়ে বাঁচা। বর্তমানের মুখোমুখি হওয়া, প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তাঁদের কাছে দুনিয়াই সারবস্তু, এখানেই স্বর্গ-নরক, এখানেই বিচার ও মুক্তি।

ধর্মে ও প্রগতিশীলতায় আমরা এমনই প্রশ্নহীন বোবায় পরিণত হয়েছি যে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। লোকসমাজের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাউলগণ এখনও পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছেন সেই পরম্পরা– যেখানে আত্মিক ও পারমার্থিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে জীবন ও জগতকে প্রেম ও আত্মজিজ্ঞাসাময় সম্ভাবনার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। দার্শনিকভাবে সমাজ ও জীবনকে মূল্যায়ন করা হয়। জীবনের গভীরতা ও অর্থবহতা অনুসন্ধানে বাংলার প্রকৃত বরপুত্র এঁরাই। বাঙালির সাংস্কৃতিক ধর্মকে চিনতে হলে এর ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

কর্মলিপ্ত মানুষ কার্যকালে 'কর্মটাই আমি', এই বোধ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে অন্তরে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটে অন্যরকম। প্রচেষ্টার পরিণামে অভীপ্সিত ফল দেখা দেয় না। শক্তির এই ব্যর্থতা তখন তার শক্তিতে বিশ্বাসকেও আঘাত করে। আনন্দের সন্ধানে সে কর্ম করে, বস্তুকে কামনা করে, বস্তু আসে; কিন্তু আনন্দ মেলে না। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪, পৃ. ৫২)

এ হেন অবস্থায় সবটাই তার কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই দুর্বোধ্য রহস্যের কথাই বাউল সহজ ও সরল করে বুঝিয়ে দেয়। তাই এই গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয় সহজেই। শ্রোতা গানে একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবৃতি শোনে। এখানেই শিক্ষা। বলা বাহুল্য এই শিক্ষা কর্মত্যাগের শিক্ষা নয়, কর্মে কর্তৃত্বারোপ ত্যাগের শিক্ষা, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনের শিক্ষা। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪, পৃ. ৫৩)

জীবনের পথে মানুষ যখন আপন শক্তির অভাবিত পরাজয় এবং অপ্রত্যাশিত নিষ্ফলতার সম্মুখীন হয়, তখন তার অতিসচেতন আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। অহংকারের নিদারুণ অপমানজনিত ক্ষোভ ও দুঃখে সে একান্ত কাতর হয়। বাউল গানের শিক্ষা তার এই দুঃখে শান্তির প্রলেপ। শান্তির অব্যবহিত ফল আনন্দ। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪, পৃ. ৫৪)

পরিবর্তন ছাড়া কাল মহাকালকে ধরতে পারে না। প্রতিটা কালই একেকটা পরিবর্তনের মাধ্যমে মহাকালে যুক্ত হয়। বাউলরা কালপর্বের পরিবর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক। এই পরিবর্তন কীভাবে ঘটবে, কে ঘটাবে– এসব বিষয়ও তাঁরা আলোচনা করেন। তাঁদের সমাজবিশ্লেষণের রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি, যা তাঁরা অত্যন্ত সহজভাবে করতে জানেন। পৃথিবী জুড়ে যে অস্থিরতা ও সংকট তার পরিবর্তন কীভাবে ঘটবে সে ফর্মুলা তাঁরা জানেন না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারেন যে কাল ঠিক কোনসময়ে তার দিক বদলে মহাপরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। আমরা এমনই এক পরিবর্তনের মহাকাল-দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে সরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু খুব কম মানুষই এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন।

বাংলার আত্মশক্তি অনুধাবনে বাউলচেতনা কীভাবে নানান সাধনা ও জ্ঞানমার্গকে আত্মস্থ করে টিকে আছে, আজ পর্যন্ত তা বড়োই বিস্ময়কর। এই বিস্ময় আমাদের কাছে এক রহস্যময় অধ্যায় বলে মনে হয়। বাউল গান বাউল সমাজের সাধনার উপকরণ হিসেবে যেমন বিবেচিত, তেমনি সংগীতরসিকের মরমী চিত্তকে আলোড়িত করতে সক্ষম, পাশাপাশি সমাজভাবনার অনুষঙ্গেও তা মূল্যবান। বাউল গানে বিশ্ব-মানবমৈত্রীর উপকরণ আছে। আজ আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের উত্থানের কালে, মনুষ্যত্ব-মানবতার লাঞ্ছনার সময়ে, সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বৈরী যুগে বাউল গান হতে পারে প্রতিবাদের শিল্প, শান্তি ও শুভবুদ্ধির প্রতীক – মানুষের প্রতি হারানো বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার পরম পাথেয়।

সূত্রনির্দেশ:

১। করীম, আনোয়ারুল (২০১৬). *বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কথাপ্রকাশ।

২। খান, মোবারক হোসেন (২০০৭). *লালন সমগ্র*, গীতাঞ্জলি।

৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৩৫২). *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (৩য় সং.), মিত্র ও ঘোষ।

৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৩৬৭). *সাংস্কৃতিকী*, *১*, বাকসাহিত্য।

৫। দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র কুমার ও অন্যান্য (২০০০, সম্পা.). *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ (১৯৫৪). *বাঙলার বাউল: কাব্য ও দর্শন*, বুকল্যাণ্ড।
৭। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (১৯৪৪, সম্পা.). *মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। শরীফ, আহমদ (২০০৬). *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া।
৯। সেন, ক্ষিতিমোহন (১৩৫২). *বাঙ্গলার সাধনা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
১০। Jenkins, Richard (1996). *Social Identity*, Routledge.
১১। Kroger, Jane (2004). *Identity in Adolescence: The Balance between Self and Other* (3rd ed.). Routledge.
১২। Mishra, Bapi & Khatun, Moslema (2014). A Study on Self Identity Crisis of secondary Students. *International Journal of Informative and Futuristic Research, 2*(4).
১৩। Parsons, Talcott (1991). *The Social System*, Routledge.
১৪। Tylor, Edward Burnett (1871). *Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 01*, John Murray Albemarle Street.
১৫। Wendt, Alexander (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization, 46* (2), Cambridge University.